Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501069 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Essence of Suchitra Bhattacharya's 'Anubhav': The Language of Love
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অনুভব'এর অনুভূতি: ভালোবাসার ভাষা

Dr. Mitali Biswas
Guest Professor
Bengali Department
Santhal Pargana College, Dumka, Jharkhand

Received on: 10th May 2026
Accepted on: 24th May 2026

Abstract:
Suchitra Bhattacharya, a renowned fiction writer of the twenty-first century, has effectively compiled a lexicon of marital relationships within her stories and novels. The dynamics of conjugal life — spanning various social strata and age groups — are portrayed with exquisite precision in her writing. We encounter the story of just such a unique couple in her short story, 'Anubhav' (The Feeling). The presence of Nirmalya introduces a layer of complexity into the middle-aged marital life of Pratima and Sitangshu. This complication stems, in reality, from Sitangshu's jealous love — an intensity that has repeatedly wounded Pratima. Yet, ultimately, Nirmalya's brief, silent presence — lasting but two days — seems to have taught Sitangshu the true essence of love, and, more importantly, how to cherish it.

Key Words:
Suchitra Bhattacharya, experience, marital relationship, love, emotions, Pratima, Sitanshu, Nirmalya

মূল প্রবন্ধ

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্প ও উপন্যাসকে বাঙালির দাম্পত্য সম্পর্কের এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পগুলিই বিভিন্ন বয়সের দাম্পত্য সম্পর্কের ভাষ্য রচনা করে। বাংলার বাইরে জন্মালেও, তিনি বাংলা তথা কলকাতাকেন্দ্রিক হয়ে বেড়ে ওঠার জন্য, বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে শিখেছেন। বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনভাষ্য তৈরিতে তিনি প্রায় অদ্বিতীয়। মধ্যবিত্তের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলেও, তাঁর মুন্সিয়ানা দেখা যায় মধ্যবিত্তের দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর। বিভিন্ন বয়সের দাম্পত্য সম্পর্কের খতিয়ান তিনি রেখে গেছেন স্বরচিত সাহিত্যে। তাঁর সিংহভাগ ছোটোগল্পগুলিই এই দাম্পত্য সম্পর্কের হাল-হকিকতের প্রমাণ দেয়। সাধারণ দাম্পত্য জীবন, দাম্পত্য প্রেম, দাম্পত্য জীবনে পরকীয়া, ত্রিকোণ প্রেম, বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী দাম্পত্য জীবন এবং দাম্পত্য জীবনের শেষ ধাপে পৌঁছে যাওয়া নর-নারীদের কথা সবই রয়েছে তাঁর ছোটোগল্পে। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত তাঁর তিনখণ্ডের ছোটোগল্প সমগ্র বিস্তারিত অনুসন্ধান করে, আমরা কয়েকটি ছোটোগল্পকে নির্বাচিত করেছি। এগুলির মধ্যে রয়েছে — 'মোহনায় এসে', 'বিভ্রম', 'গ্রন্থি', 'মনের মধ্যে মন', 'যখন দুজনে একা', 'হায় প্রেম', 'পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স', 'ছবি', 'আছি... ', 'উনসত্তর আর তেষট্টি', 'এই মায়া', 'অনুভব' ইত্যাদি। এই প্রতিটি গল্পে দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে। যেখানে শারীরিক চাহিদার থেকেও মানসিক নির্ভরতা অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেখানে প্রেম কামের পথ পেরিয়ে

এসে জ্বলে পুড়ে 'নিকশিত হেম'এ পরিণত হয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের এই গল্পগুলি অনুসরণ করে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে কেমন ছিল বাঙালি দম্পতিদের সম্পর্কের রসায়ন। তাদের মধ্যে ভালোবাসা বা ভালোবাসার অনুভূতি, অর্থাৎ পরস্পরকে বুঝতে পারার অনুভূতি কতটা বেঁচে থাকলো বা পোক্ত হলো। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপরিউক্ত গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে শেষ বয়সের বিভিন্ন ছন্দের দাম্পত্য জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। আজ সেগুলিই আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। যদিও আমাদের মূল আলোচনার বস্তু তাঁর 'অনুভব' গল্পটি কিন্তু অবধারিতভাবেই অন্যান্য গল্পের প্রসঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্রে এসে পড়বে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অনুভব' গল্পের প্রথমেই আমরা দেখতে পাই প্রতিমা, নির্মাল্য ও সিতাংশুকে। সিতাংশু ও নির্মাল্যকে খেতে দিতে গিয়ে প্রতিমা লক্ষ করছেন এইবারে বেয়াইমশাই অর্থাৎ নির্মাল্যর ধরন-ধারন যেন একটু অন্যরকম, "বড় শান্ত চুপচাপ ধরনের হয়ে গেছেন নির্মাল্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রাক্তন ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার যেন এখন অতীতের মলিন ছায়া। আগের মতো গমগম হাসি নেই, হঠাৎ হঠাৎ রসিকতা নেই, তিনবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায়, পাঁচ-দশ মিনিট আগের কথা বেমালুম ভুলে যান, সাধারণ প্রশ্ন করলে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন। বুড়ো বয়সে বউ মরে গেলে পুরুষমানুষের কি এই দশাই হয় ?"[১] গত শীতে নির্মাল্যর স্ত্রী অর্থাৎ নূপুরের মা সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গেছেন। তারপর থেকেই নির্মাল্য যেন এহেন অবস্থা। ইদানিং নির্মাল্য পিঠের ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। দুর্গাপুর, আসানসোলে অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোনো সুরাহা হয় নি। তাই নূপুর, বাবাকে কলকাতায় এনেছেন স্পেশালিস্ট দেখাবেন বলে। এবারে প্রতিমা লক্ষ করেছেন নির্মাল্যর স্বভাব ও ব্যবহারের পরিবর্তন। প্রতিমার রান্না করা বিভিন্ন নিরামিষ খাবার খেয়ে তিনি প্রভূত প্রশংসা করেছেন। একই সঙ্গে সিতাংশু যথারীতি প্রতিমা রান্নার খুঁত ধরেছেন। প্রতিমা তখন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন — "বটেই তো। বটেই তো। সারাটা জীবন যে লোক বউয়ের ত্রুটি খুঁজে বেড়ান, তাঁর আর এ ছাড়া কী-ই বা মনে হবে! সাধে কি প্রতিমা রান্নাঘরে যাওয়া ছেড়েছেন!"[২] প্রতিমার সমস্ত রান্নাতে বিভিন্ন রকম খুঁত ধরে এসেছেন চিরটাকাল সিতাংশু।

অনেকদিন পর বেয়াইমশাই আসায় প্রতিমা তাকে দুই-একটা সামান্য নিরামিষ পদ রান্না করে খাওয়ানোর কারণেই পুনরায় রান্নাঘরে ঢুকেছেন। সেক্ষেত্রেও নির্মাল্যের মুখে প্রতিমার রান্নার প্রশংসা শুনে সিতাংশু টিপ্পনি করেছেন। কথায় কথায় নির্মাল্য যখন প্রতিমাকে বলেন, তার স্ত্রী রান্না এবং প্রতিমার রান্না দুটোই ভালো। তবে দুরকম। তখন সিতাংশ আরো একটু হুল ফুটিয়ে বলেন — "একজনেরটা চিনি, অন্যজনেরটা গুড়। দুটোই মিষ্টি, কী বলেন ?"[৩] বারংবার সিতাংশুর এরকম টিপ্পনিতে প্রতিমা অপমানিত হয়েছেন। সিতাংশু, প্রতিমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন নির্মাল্য দস্তিদার মহা ধূর্তলোক। তিনি প্রতিমার রান্না খেয়ে প্রশংসা করছেন না, বরং ঘুরিয়ে নিজের ছেলের বউয়ের নিন্দে করছেন। এবং এটাও বলেছেন, তার মেয়ে অর্থাৎ নূপুর কোনোদিন শ্বশুর-শাশুড়িকে তাদের পছন্দের পদ রান্না করে খাওয়ায়নি। তাহলে নির্মাল্যর চাকুরীজীবী বৌমা, তাকে রান্না করে না খাওয়ালে, কেন খেদ থাকবে? বলাবাহুল্য, এই সমস্তই সিতাংশুর জটিল মনের কল্পনা। প্রতিমার ভাষায় — "কী প্যাঁচ, কী প্যাঁচ! জিলিপির ঠাকুরদাদা অমৃতি! এমন প্যাঁচোয়া লোককে সামলে কি করে যে চল্লিশটা বছর ঘর করলেন প্রতিমা! এদিকে কুট কুট করে ছেলের বউ-এর নিন্দে করবেন, ওদিকে তার সামনে একেবারে আদর্শ শ্বশুরটি।"[৪] অথচ, নানা সময়ে বৌমার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিমা বিরক্ত হলে, সিতাংশু প্রকাশ্যে নূপুরকে সমর্থন করেছেন। নাতি হওয়ার পর, বউমা নূপুরের চাকরি করা নিয়ে প্রতিমার মতবিরোধ ছিল। কিন্তু সীতাংশু বৌমার সামনে 'রামমোহন বিদ্যাসাগর' সেজে, তাকে চাকরি করার জন্য সমর্থন করেন। ছেলে-বৌমার নাতিকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করা নিয়ে প্রতিমার ক্ষোভ থাকলে, নির্মাল্য তাকে ভৎসনা করে বলেন, ছেলের মা ছেলের ভালোর জন্য যা করেছে, সেটাই ঠিক। নূপুর যে নিজের বাবার চিকিৎসার জন্য, তাকে কলকাতায় আনছে, সেকথা সে, প্রতিমাকে আগে একবারও জানায় নি। এ বিষয়েও সিতাংশু প্রতিমাকে অপদস্ত করে জানায়, নিজের বাবার চিকিৎসা করার জন্য নূপুর কেন শাশুড়ির অনুমতি নেবে? প্রতিমা যদি কোনোদিন নূপুরকে শখ করে কিছু রান্না করতে বলেন, অমনি সিতাংশু প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন — "সারাদিন অফিসে খাটাখুটি করে মেয়েটা, আবার হেঁসেলেও ঢুকবে !"[৫] সেই সিতাংশু যখন আড়ালে ছেলের বউয়ের নিন্দা করেন, তখন প্রতিমার মনে হয়, সিতাংশু লোক বটে একখানা! একজনকে দেখলেই

© Santiniketan Sahityapath

যেন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে যায়। সত্যিই হয়তো তাই। যে সিতাংশু আকণ্ঠ বিষ নিয়ে সারাজীবন ধরে স্ত্রীর রান্নার অখ্যাতি করে এসেছেন, তিনিই আবার প্রৌঢ়া স্ত্রীর দীর্ঘ সময় রান্নাঘরে কাটিয়ে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার জন্য দুর্ভাবনা করেছেন। সিতাংশু প্রতিমাকে একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার কথা বললে প্রতিমা জানায়, পাশের ঘরে স্ত্রী-হারা বেয়াইমশাই একাকী আছেন তাই তাদের একসঙ্গো ঘুমোনো কিছুটা দৃষ্টিকটু লাগে। প্রতিমার এহেন যুক্তিতে সিতাংশু অবাক হয়ে গেছেন। যাইহোক, সিতাংশু ঘুমিয়ে পড়ার পর প্রতিমা হেমন্তের পড়ন্ত দুপুরে বাইরের বারান্দায় বিশ্রাম নিতে এসে দেখেছেন, নির্মাল্য নিচের কাঁচা উঠোনে গাছপালা নিরীক্ষণ করছেন। নিচের আগাছা বাগানে কয়েকটি ফুলের চারা বেরিয়েছে শুনে, প্রতিমার মনটা প্রসন্ন হয়ে যায়। তাদের বাড়িতে প্রতিমা ছাড়া আর কারোরই গাছের শখ নেই। প্রথম প্রথম প্রতিমাই শিউলি, টগর, গাঁদা প্রভৃতি ফুলের চারা লাগালেও, বয়সের ভারে ও উৎসাহের অভাবে এখন আর পেরে উঠে না। নবাগত ফুলের চারাগুলির যত্ন করার প্রসঙ্গো নির্মাল্য বলেন — "পৃথিবীতে নতুন প্রাণ আসছে, তাদের একটু খাতিরদারি করতে হবে না ?"[৬] নির্মাল্যর এই কথাগুলি প্রতিমার কাছে বড়ো মধুর লেগেছে — "প্রতিমার বুকে টুং করে বাজল কথাটা। অচেনা পাখির ডাকের মতো কোমল দুপুরটার মতো।"[৭] এরপর বাকি দুপুরটা প্রতিমা ও নির্মাল্য গাছের পরিচর্যা করেছেন এবং নিজেদের অজান্তেই মনের কথা প্রকাশ করেছেন। যেমন নির্মাল্য বলেছেন, গাছ খুব ভালো সঙ্গি। তেমনি প্রতিমাও বলেছেন, যা ইচ্ছে কথা শোনাতে পারা যায় জবাবটি দেবে না। তখন নির্মাল্য অন্যমনস্ক স্বরে বলেছেন — "নীরব থেকেও তো অনেক কথা বলা যায়। আপনার বেয়ানকে তো চিনতেন, দিনে রাতে ক'টা কথা বলত সে?... আমি তো একাই বকে মরতাম।"[৮] একথা শুনে প্রতিমা বেয়ানের অসময়ে মৃত্যুর জন্য আফসোস করলে নির্মাল্য আবার বলেন — "মৃত্যুর কি সময়-অসময় আছে?... পৃথিবীতে তার কাল ফুরিয়েছিল, সো শি হ্যাড টু ডিপার্ট।"[৯]

পড়ন্ত বেলায় এই আত্মভোলা মানুষটাকে দেখে প্রতিমার ভারী মায়া হলো। নির্মাল্য কাজ করতে করতে মাটি মাখামাখি হয়ে যাওয়ায় প্রতিমা নিজের আঁচল দিয়ে তার পাঞ্জাবির পিঠটা ঝেড়ে দিয়েছেন। তখনি তার হঠাৎ চোখ গেছে দোতলায়। সিতাংশু কখন দিবানিদ্রা ভঙ্গা দিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছেন। প্রতিমা অবাক হলো, চারটের সময় চা না দিলে যার ঘুম ভাঙে না, তিনি আজ নিজেই আগে আগে উঠে পড়েছেন। সন্ধ্যার মুখে মুখে সিতাংশু পূর্বদিনের মতো নির্মাল্যকে নিজের বন্ধুদের তাসের আড্ডায় নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু শরীর ভালো না লাগায় নির্মাল্য যেতে রাজি হন না। পরে প্রতিমা প্রশ্ন করে জানতে পারেন, নির্মাল্যর পিঠের ব্যথাটা চাগাড় দিয়েছে যার উৎস ছিল পঁচিশ বছর আগে প্ল্যান্টে কাজ করার সময়ের একটা ছোট্ট অ্যাক্সিডেন্ট। এই কারণে রিটায়ারমেন্টের পরে হাঁটাচলা কম হয়ে যাওয়ায় ব্যথাটি পুনরায় জেগে উঠেছে। প্রতিমা বলেন, নির্মাল্য তবে সিতাংশুর সঙ্গো বাইরে ঘুরে আসলেই পারতেন। এর উত্তরে সিতাংশু জানান — "তাস পাশা আমার ভালো লাগে না বেয়ান। জন্মে কখনও খেলিনি তো। স্পেড হার্ট নো ট্রাম্প শুনলে কেমন চমকে চমকে উঠি। নিজেকে বেশ ইডিয়টিক লাগে। তবে হ্যাঁ, বেয়াইমশাইয়ের বন্ধুরা সজ্জন ব্যক্তি, গল্পগুজব করাই যায়। কিন্তু মুশকিল হলো, ওঁদের টপিক একটাই। পলিটিক্স। মিস্ত্রি মজুর খাটানো মানুষ তো, ভোঁতাবুদ্ধি। ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধির শাস্ত্রটি আমার পছন্দ না।"[১০]

নির্মাল্যর শেষ কথাটির মর্মার্থ প্রতিমা ঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলেও, তিনি বুঝতে পারেন নির্মাল্য ব্যথায় বেশ কাতর হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর তুকতাক মালিশের প্রভাবে নির্মাল্য পিঠের ব্যথা এতদিন বিশেষভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। হেমন্তের সন্ধ্যায় বারান্দার ঠান্ডা হাওয়ায় শীতের প্রসঙ্গা উঠলে, নির্মাল্যর মনে পড়েছে তাঁর স্ত্রী খুব শীতকাতুরে ছিলেন। গত শীতে সেরিব্রাল অ্যাটাকে তার স্ত্রী মারা গেছেন। প্রতিমার মনে হয়েছে শীতের সঙ্গো সেরিব্রালের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তিনি এটাও বুঝতে পেরেছেন জীবনের উপান্তে এসে মানুষটা নিজের সঙ্গীকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। স্ত্রীর এই অকস্মাৎ বিয়োগ নির্মাল্য কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। প্রতিমার সঙ্গো সমস্ত কথোপকথনেই বারংবার স্ত্রীর কথা বলছেন তিনি। নির্মাল্যর এই যন্ত্রণা প্রতিমাকে ভীষণভাবে স্পর্শ করেছে। এই কারণে প্রতিমাও ভেতরে ভেতরে নির্মাল্যর সহমর্মী হয়ে উঠেছেন। প্রতিমা নিজের ঘর থেকে ব্যথার মলমের টিউব এনে দিয়ে, নির্মাল্যকে ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে নিতে বলেছেন। আর আর সিতাংশুর চাদরটা দিয়ে বলেছেন

 © Santiniketan Sahityapath

গায়ে জড়িয়ে নিতে।

এরমধ্যেই সিতাংশুকে বাড়ি ফিরে আসতে দেখে প্রতিমা ভীষণ অবাক হয়েছেন। প্রতিমা খোঁচা মেরে জানতে পেরেছে, সিতাংশুর তাসপ্রেমী বন্ধুরা, প্রত্যেকেই নাকি আজ ডুব মেরেছে। তাই অগত্যা সিতাংশুকে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে গুম হয়ে থাকা সিতাংশ রাত্রে শোবার সময় প্রতিমাকে বলেছেন, পুজোর সময় কিনে আনা ব্যথার মলমটা পুরোটাই তিনি বেয়াইয়ের পিঠে মালিশ করে দিয়েছেন। প্রতিমা বলেছেন, এ কথার মধ্যে দিয়ে সে নিজের ছোটো মনেরই পরিচয় দিচ্ছে। তখন প্রতিমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে এর জবাবে সিতাংশু জানিয়েছে — "হাহ্, আমারই তো ছোট মন!... নিজের মন তো খুব বড়। আমি মানুষটা ঠাণ্ডায় হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলাম, তাকে একটা শাল কম্ফর্টার দেওয়ার কথা মনে পড়ল না, আর তিনি আমারই ইজিচেয়ারে শুয়ে আমার চাদরে ওম নিচ্ছেন! দুর্ভাগা অভাগা হওয়ার ভারী মজা, অ্যাঁ?"[১১] সিতাংশুর এই অপবাদ শুনে রাগে, ঘৃণায় প্রতিমার সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে ওঠে। প্রতিমা মনে মনে বলেছেন — "এক পা ঘাটে বাড়িয়ে বসে আছেন, এখনো কুচুটেপনা হিংসুটেপনা গেল না! বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল প্রতিমার, এখনো তাঁকে সন্দেহ করা! ছি ছি ছি ছি।... এই জন্যই দুপুরে বারান্দা থেকে উঁকি মারছিল? তাসের আসর থেকে ফিরে এসেছেন? টিকটিকিপনা? প্রাণ থাকতে এই মানুষটার সঙ্গে আর কথা বলবেন না প্রতিমা।"[১২] অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে এইসবই ভেবেছেন প্রতিমা। পরদিন রাত আটটায় ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে এসে, মনমরা নির্মাল্য আগামীকাল ভোরেই বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছেন। বেয়াইমশায়ের এই ঘোষণায় প্রতিমার ভেতরটা কুঞ্চিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন সংশয় তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে। তাঁর মনে হয়েছে সিতাংশুর কোনো ব্যবহারে বা কথায় নির্মাল্য আহত হয়েছেন। অথবা তিনি খেয়াল করেছেন সিতাংশু ও প্রতিমার বাক্য বিনিময় বন্ধ। প্রতিমা মনে মনে ভেবেছেন — "বেয়াইমশাই নিজেকে যতই ভোঁতামস্তিষ্ক বলুন, তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর। আলাভোলা হতে পারেন, শিশু তো নন। কুটুমের কাছে মানসম্মান কিছু রইল না। কী লজ্জা, কী লজ্জা!"[১৩] প্রতিমা মরমে মরে যেতে যেতে বারংবার ভেবেছেন সিতাংশুকে ক্ষমা চাইতে পাঠাক। কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। সারারাত অনিদ্রার পরে ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়ে প্রতিমা। যাই হোক, ভোররাতে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে স্টেশনে চলে গেছেন নির্মাল্য। সকালে ঘন কুয়াশার পর্দা সরিয়ে পৃথিবীতে সূর্যের আলো উঁকি দিতেই প্রতিমা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় — "সহসা ভীষণ জোর নাড়া খেয়ে গেলেন প্রতিমা। নিচের উঠোনে সিতাংশু। মগে করে জল দিচ্ছেন ফুলগাছের চারায়! গাছের গোড়াগুলো খোঁচাচ্ছেন কাঠি দিয়ে, আবার চেপে চেপে দিচ্ছেন মাটি। প্রতিমা ফিক করে হেসে ফেললেন। ঈর্ষার উত্তাপই বুঝি বেঁচে থাকাটা আজও রঙিন করে দেয়। পাগল, লোকটা এক্কেবারে পাগল।"[১৪]

ঈর্ষার উত্তাপ ষাটোত্তীর্ণ এই দম্পতির সম্পর্ক এক রঙিন বাতাস বইয়ে দিয়েছে। আসলে এই বয়সে এসে শরীরের চাহিদা যখন প্রায় শেষ হয়ে যায়, তখন মনের চাহিদাগুলি বড়ো বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। মনের ভেতরে থাকা বিভিন্ন রন্ধে সুক্ষ সুক্ষ অনুভূতিগুলি একে অপরের জন্য কাজ করতে থাকে। সেই অনুভব বা অনুভূতি থেকেই সিতাংশুর হাজার অপমানের পরেও প্রতিমা তাঁর স্বাস্থ্যের খেয়াল রেখেছেন। হেমন্তের দুপুরে জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসায় সেটা বন্ধ করে দিয়ে, ফ্যানের স্পিড কিছুটা কমিয়ে দিয়েছেন ঘুমন্ত সিতাংশুর ঘরে। আর সেই রকমই কোনো অনুভূতি থেকেই সিতাংশু এতদিন পর প্রতিমার পছন্দের ফুল গাছের চারাগুলির পরিচর্যা করেছেন। এক একটি মানুষের ভালোবাসা ও যত্ন দেখানোর ভঙ্গি একেক রকমের। দীর্ঘদিন একসঙ্গে যাপন করা দম্পতিরা হয়তো নিজেরাও সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে না একের অপরের প্রতি টান বা ভালোবাসা। সেই অনুভূতিগুলি দৈনন্দিন ব্যবহারের ভিড়ে মনের গভীরে চাপা পড়ে থাকে। তাই হয়তো, সিতাংশু যখন দেখেছেন পত্নীবিয়োগ নির্মল্যের প্রতি প্রতিমার নানা ভাবনা। তখনি তিনি শিশুর মতো অহেতুক বিষয় নিয়ে প্রতিমার সঙ্গে বিবাদ করেছেন। নির্মাল্যকে ঈর্ষা করেছেন। তা না হলে হেমন্তের সন্ধ্যাবেলায় কলকাতাতে কোন মানুষ 'ঠাণ্ডায় হি হি' করতে পারে না। বা যে সিতাংশু বৌমাকে চাকরি করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, বৌমার সমস্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন, অফিসের খাটুনির পরে বৌমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দিতে চান না, তিনি সামান্য একটি মলমের জন্য ছোটো কথা বলতে পারেন না। আসলে এগুলি ভালোবাসার ঈর্ষা। নিজের ভালোবাসার মানুষটা যখন অন্য কারোর প্রতি বেশি সহানুভূতি প্রকাশ

© Santiniketan Sahityapath

করে, তখন অনেকেই সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারে না। উল্টোদিকে নির্মাল্যও জাগতিকভাবে স্ত্রীকে হারিয়ে, মানসিকভাবে স্ত্রীর স্মৃতি ও ভাবনার মধ্যেই ডুবে আছেন। সিতাংশু ও প্রতিমার সমস্যা নয় হয়তো নিজের পরিসরে স্ত্রীর স্মৃতির তাড়নায় তাকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুরে নিয়ে গেছে। প্রত্যেকেই যেন মানসিক অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। যাইহোক, এই মানুষগুলির মানসিক ভাবভঙ্গি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে আমাদের আরো কয়েকটি কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মোহনায় এসে' গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই মানবেন্দ্র ও নির্মলার পঞ্চাশ বছরের বিবাহবার্ষিকী খুব ঘটা করে উদযাপন করছে মেয়ে-জামাই, ছেলে-ছেলের বউ এবং নাতি-নাতিরা। তারা উপরিপর বিরক্ত হলেও, মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছে। মানবেন্দ্রের উচ্ছ্বাসটা বাহ্যিক প্রকাশিত। তাই নির্মলা তাকে বারংবার কথা শুনিয়েছে। শোবার ঘরে এসে খাট ফুলশয্যার নিয়মে সাজানো দেখে মানবেন্দ্র মজা করে বলেছেন — "আহা মন্দ কী! ফুলশয্যাটি না হলে কি আজ ষোলকলা পূর্ণ হত?"[১৫] এ কথা শুনে নির্মলা জ্বলে পুড়ে ওঠে বলেছে — "ঢং করো না তো। যত সব ধ্যাষ্টামি। চিতায় পা বাড়িয়ে রয়েছি, এখন কিনা ফুলশয্যা!"[১৬] উত্তরে মানবেন্দ্র বলেছে, এক পা চিতায় আছে বলেই এই ফুলশয্যার বাসর এত মধুর লাগছে। তার মনে হচ্ছে যৌবন যেন দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছে। এইভাবে সারাদিনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বাদানুবাদের আড়ে যেন ছোটোখাটো খুনসুটি চলতে থাকে। খাটের উপর রজনীগন্ধার জালি, বিছানার ফুলের পাপড়ি ও মালাবদলের মালা দুটি — সব কিছুই নির্মলা সরিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়। মানবেন্দ্রর বিরক্তি লাগলেও, আজকের রাতেও এইসমস্ত কিছু সরিয়ে নির্মলার জন্য মশারি টাঙাতে হবে। বারোমাস মশারি ছাড়া নির্মলার চলে না। যতই গরম থাকুক ফ্যানের স্পিড কম করতেই হবে। অসুবিধা সত্ত্বেও মানবেন্দ্র নির্মলার এই বাতিক মেনে নিয়েছে এবং নিজেকে সেইভাবে অভ্যস্ত করে তুলেছে।

নির্মলা রাতে অন্তত তিনবার উঠবে। প্রত্যেকবার এক চুমুক করে জল খাবে এবং ফ্যানের স্পিড এক পয়েন্ট করে কমিয়ে দেবে। মানবেন্দ্র ঘেমে নেয়ে গেলেও তার কোনো হেলদোল নেই। অন্যদিকে জামাকাপড় ছেড়ে দিয়েই মানবেন্দ্র খালাস। সেগুলি ভাজ করা, গুছিয়ে রাখা, মশারি গোঁজা, এইসমস্ত কিছুর দায়িত্ব নির্মলার। চোখের সমস্যায় নির্মলার না খুঁজে পাওয়া ওষুধ খুঁজে দিয়েছে মানবেন্দ্র। মানবেন্দ্র তাকে বলেছে, পুত্রবধূ শর্মিলার সঙ্গে একবার চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে। নির্মলা এতে খুব বেশি আগ্রহ দেখায় না। এরপর রাতের অন্ধকারে সুন্দর দিনটির শেষলগ্নে স্বামী-স্ত্রী ফেলে আসা জীবনের হিসাব-নিকাশ করতে শুরু করেছে। মানবেন্দ্র জমার অঙ্ক কষেছে নিজের ব্যালেন্স সিটে। সে একখানা বাড়ি বানিয়েছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত ও মানুষ করে তোলার চেষ্টা করেছে। তার পুত্রবধূ পি.এইচ.ডি উপাধিধারী এবং কলেজ শিক্ষিকা। নাতি-নাতনিদের ভবিষ্যতও তার যথেষ্ট উজ্জ্বল বলেই মনে হয়। এসব শোনার পর নির্মলা ভার ভার গলায় জীবনের না পাওয়ার ব্যালেন্স শিট কষেছে। বি. এ. ফাইনাল দিয়েই নির্মলার বিয়ে হয়ে যায়। তার রেজাল্ট নেহাত মন্দ ছিল না। এম. এ পড়ার এবং আরো উচ্চশিক্ষা করার খুব ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু সন্তান ও সংসারের যাঁতাকলে পড়ে তার উচ্চশিক্ষা করার ইচ্ছা কবরস্থ হয়ে গেছে। তবে তার যন্ত্রণা আজও নির্মলা মনে দগদগে হয়ে আছে। তাই সে মানবেন্দ্রকে বলে, পড়াশোনা করতে পারলে সেও পুত্রবধূ শর্মিলার মতন কোনো কলেজে পড়াতো। কারণ নির্মলা জানে সে যোগ্যতা তার আছে। নির্মলার মনে হয়েছে মানবেন্দ্র জীবনটা তার মর্জিমাফিকই চলেছে। এইজন্যই তার জমার খাতা এত পরিপূর্ণ। কিন্তু মানবেন্দ্র জানাই সংসারের প্রয়োজনে তাকেও প্রিয় ক্রিকেট খেলা ছেড়ে চাকরি-বাকরিতে মন দিতে হয়েছে। এরপর অবশ্য পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তারা ফিরে গেছে বিয়ের প্রথম দিককার বিবাহবার্ষিকীগুলিতে। মানবেন্দ্র পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীতে নিজের জীবনের এক চরম সত্যকে নির্মলার সামনে উদ্ঘাটন করেছে।

আটত্রিশ-ঊনচল্লিশ বছর আগের এক নিষিদ্ধ প্রেমের কথা মানবেন্দ্র নির্মলাকে বলেছে। আর তখনি জানতে পেরেছে নির্মলা বরাবরই খবরটি জানতো। কিন্তু মানবেন্দ্রকে কখনো কিছু বলেনি। ভীষণ অবাক হয়ে মানবেন্দ্র বলেছে, সে যদি তাদের ছেড়ে চলে যেত তাহলে কি হতো? উত্তরে নির্মলা এক বাস্তব জীবন যোদ্ধার মতো বলেছে — "জানি না। ভাবিনি। জীবন তো নদীর মতো। বয়ে চলেছে। ধাক্কা খেয়ে হয়তো কোনও একটা বাঁক নিত। আবার চলত।"[১৭] কথাগুলি বলেই নির্মলা সমস্ত বিষয়টা সহজ করে নিতে

© Santiniketan Sahityapath

চেয়েছে। কিন্তু মানবেন্দ্রর নিজেকে ভীষণ ছোটো লেগেছে। আবার নির্মলার জন্য গর্বও হয়েছে। বাইরে বৃষ্টির রোল বাড়ছে, কমছে। বন্ধ জানলায় দমকা হাওয়া লাগছে। আর ভেতরে মন্থর লয়ের একটানা ফ্যানের ঘূর্ণনে পঞ্চাশ বছরের পুরোনো দাম্পত্য ঘুমোচ্ছে। সমস্ত ঘরটা ফুলের সুবাসে ভরে উঠেছে। এটাই হয়তো বাস্তব জীবন। প্রবল বর্ষণ দমকা হাওয়া মিষ্টি ফুলের সুবাস সবকিছু মিলেমিশেই নির্মলা ও মানবেন্দ্রর দাম্পত্য জীবন মোহনায় এসে পৌঁছেছে।

আবার সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘বিভ্রম’ গল্পে দেখি, সুজাতা ও অতীশ ছেলে বৌমার সংসারে দিল্লীবাসী। একদিন সকালে হঠাৎই সুজাতা আবিষ্কার করেন অতীশ সুজাতাকে চিনতে পারছে না। অথচ বারবার সুজাতাকেই খুঁজছে। কিন্তু তার সামনে থাকা রক্তমাংসের বাস্তব সুজাতাকে সে বেমালুম ভুলে গেছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে অতীশের এই অস্বাভাবিকতার হালহদিস থাকলেও, চুয়াল্লিশ বছর একসঙ্গে থাকার পর সুজাতা বারবার নিজের জীবন ও মন হাতড়ে এর কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। তার মনে হয়েছে— “অতীশের স্মৃতিবিভ্রম কি নিতান্তই এক অসুখ। যে অবয়বটিকে অতীশের সবচেয়ে আপন ভাবার কথা, তাকেই সে ভুলে গেল বেমালুম? এ কি শুধু বিস্মরণ? নাকি এক ধরনের মানসিক প্রত্যাখ্যান? সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে যা জমতে-জমতে অতীশকে আজ ঠেলে দিয়েছে অচেতনে।”[১৮] পুরোনো কথা মনে পড়ছে সুজাতার। অতীশের বোন অঞ্জনা সুজাতাকে জানিয়েছিল, অতীশ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বাড়ির চাপে সুজাতাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, সে মঞ্জুলা নামে তার এক আত্মীয়াকে ভালোবাসত। ফুলশয্যার রাত থেকেই অতীশ সুজাতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর সময় গড়িয়ে যেতে যেতে সুজাতাই আগে অতীশের কাছে এগিয়ে এসেছিল। এরপর ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অতীশ চাকরি ছেড়ে ছোটো ব্যবসা এবং তারপর বড়ো কারবার ফেঁদে বসে। চরম উদ্যমী হয়ে আজীবন পরিশ্রম করে চলে অতীশ। তার কাছে যেন উন্নতির কোনো চরম সীমা নেই, একের পর এক ধাপ আজীবন এগিয়ে গেছে সে। সন্তানদের মানুষ করেছে, বাড়ি বানিয়েছে, গাড়ি কিনেছে। চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠান করে ছেলের বিয়ে দিয়েছে। তবে কোনো উন্নতি বা কোনো আনন্দই তাকে যেন ভীষণভাবে কোনোদিন নাড়া দেয়নি। এক বছরের মধ্যে বাবা মা দুজনেই মারা গেছেন। তাতেও কখনো গভীরভাবে ভেঙে পড়েনি অতীশ। ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বাবার বিপুল ব্যবসার ভার না নিয়ে চাকরি নিয়ে দিল্লিবাসী হলেও কোনো তাপ উত্তাপ দেখায়নি সে। তারপর একদিন হঠাৎ অফিসে হার্ট অ্যাটাক হলো অতীশের। এনজিওপ্লাস্টি করার সময় জানা গেল অতীশের শরীরে সুগার, প্রেসার ইত্যাদি নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। এক ছাদের তলায় এক বিছানায় বত্রিশটা বছর কাটিয়েও সুজাতা বুঝতেই পারেনি, অতীশের শরীর কখন রোগের আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে। তারপর বাড়ির সবার সিদ্ধান্ত শুনে অতীশ দুমদাম করে কলকাতার সমস্ত বাড়ি-ঘর বিক্রি করে দিল্লিতে চলে এসেছে ছেলের কাছে। কোনোদিনই নিজের ভালো-লাগা, খারাপ-লাগা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ কোনো কিছুর কথাই নিজের আপন মানুষগুলির কাছে প্রকাশ করেনি সে। পরিবারের থেকে মঞ্জুলাকে বিয়ে করার প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান তাকে যেন নির্বিকার ও নিরুত্তাপ করে তুলেছিল। এই সমস্ত কিছুর শাস্তি এখন যেন সুজাতা পাচ্ছে। প্রায় চল্লিশ বছর সংসার করা সঙ্গীর বিছানায় সে এখন সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে শুয়ে আছে।

দাম্পত্য সম্পর্কের প্রথম লগ্নেই অঞ্জনা, সুজাতার মধ্যে যে সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল সুজাতা কোনোদিনই মন থেকে তাকে তাড়াতে পারেনি। আজ এই সংকটের সময়ে এসে বার বার সুজাতা সেই সাপের ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেয়েছে, “অতীশের নিরাবেগ ব্যবহারে। নিরুত্তাপ মিলনে। তার উদয়াস্ত পরিশ্রমের আড়ালে-আবডালে।”[১৯] সেই সাপটি রয়েই গেছে। তাই হয়তো বিয়ের পর থেকে মঞ্জুলার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও, অতীশ যখন জানতে পেরেছে, মঞ্জুলা ক্যান্সারে মারা গেছেন তারপরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুস্থ হয়েও পুরোনো উদ্দম সে ফিরে পায়নি। যেন একটা আধারহীন প্রেম অতীশকে কুরে কুরে খেয়েছে। স্মৃতিবিভ্রমের আগের দিন রাতে অতীশ সুজাতাকে মৃদুভাবে জানিয়েছিল, সে কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। সুজাতা রাজি হয়নি। এই নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। শেষে সুজাতা যখন অতীশকে জানাই, তারা দুজন কলকাতায় ফিরে যাবে তখন অতীশ সুজাতার সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতে চেয়েছে। তার সামনে যে অবয়বটি রয়েছে তার সঙ্গে নয়। একথা শুনে সুজাতা এক আমূল নাড়া খেয়েছে, “রাগ নয়, ক্ষোভ নয়, অভিমান নয়, হতাশা নয়, অচেনা এক শিহরণ জাগছে। অতীশ সুজাতার সঙ্গে ফিরতে চায়। যেন জগতে একমাত্র সুজাতার ওপরই

© Santiniketan Sahityapath

নির্ভর করতে পারে অতীশ। কিন্তু কোন সুজাতা? যার মধ্যে এক ফালি মঞ্জুলাও মিশে আছে? তা থাকুক না, সেই কল্পমানবীও তো এখন স্রেফ সুজাতা। শুধুই সুজাতা।"[২০] অতীশের রুদ্ধ প্রেমের অপ্রাপ্তির পরাজয়েই হয়তো সুজাতার দাম্পত্য সম্পর্কের জয় এনে দিয়েছে জীবনের শেষ লগ্নে। সুজাতার মনে হয়েছে বিভ্রমের মধ্যে দিয়েও হয়তো শেষ জীবনে এসে সুজাতাকে অনুভব করতে পেরেছে অতীশ।

'গ্রন্থি' গল্পে দেখতে পাওয়া যায় মমতা ও সুধাময়ের সম্পর্কের এক অদ্ভুত অনুভূতি। নিঃসন্তান মমতা ও সুধাময় আজীবন তুমুল ঝগড়া ও অশান্তি করে কাটিয়ে এসেছে। তাদের এই প্রাত্যহিক কলহে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাদেরই ভাড়াটিয়া রিনা, তুষার ও তাদের ছেলের বুবলু। তাদের এই প্রত্যহ যুদ্ধের শান্তি সমঝোতা স্থাপন করতে বারংবার রিনাকেই একতলা থেকে দোতালায় ছুটে যেতে হয়। কিন্তু এই মার-মার, কাট-কাট দম্পতির একজন যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন অন্যজন তার ভাষা হয়ে ওঠে। সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে সুধাময় মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কথার বদলে তার স্বরযন্ত্র দিয়ে এখন শুধু নির্গত হচ্ছে "ডা ডু ডা ডা ডু ডা... " ধরনের কিছু শব্দ। কিন্তু হসপিটালের বিছানায় শুয়ে থাকা সুধাময়ের 'ডু ডা' শব্দের প্রতিটি অর্থ পড়ে নিতে পারে মমতা। অসুস্থ সুধাময় কি চাইছে, তার কি সমস্যা হচ্ছে সমস্ত কিছু বুঝতে পারে মমতা। হসপিটালে সুধাময়ের কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে রিনা দেখতে থাকে আজীবন কলহ করতে থাকা এই দম্পতি কিভাবে একে অপরের মনের ভাবকে অনুভব করছে। গল্পকারের ভাষায় — "রিনা স্তম্ভিত। রিনা বিমোহিত। এঁরাই নাকি পরস্পরের ভাষা বোঝেননি কোনদিন? অকারণে আক্রমণ শানিয়ে গেছেন জীবনভর ? ভুল, একদম ভুল। বিদ্বেষই বুঝি এক বিচিত্র বন্ধন গড়ে দিয়েছে, যা ওই অবোধ্য শব্দরাজিকেও কিনা পড়তে শেখায়।"[২১]

'মনের মধ্যে মন' গল্পে নার্সিংহোমের লাউঞ্জে বসে মৃণাল চৌষট্টি বছরের জীবনের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল। এই পর্যন্ত সবকিছুই খুব মসৃণ ভাবে চলে এসেছে তার জীবনে। কিন্তু হঠাৎই স্ত্রী দীপার সেরিব্রাল অ্যাটাক তাকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে। সে আরো বেশি ধাক্কা খেয়েছে যখন দীপা জ্ঞান ফিরে পেয়েই সর্বপ্রথম সুজয়ের কথা জানতে চেয়েছেন। সেই সুজয়, যে দীপা ও মৃণালের বন্ধু। যৌবনে মৃণাল ও সুজয় দুজনেই দীপার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিল। কিন্তু দীপা মৃণালকেই নিজের জীবনে জায়গা দিয়েছিল। তারপর থেকে সুজয়ের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা অবশ্য শুনেছে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সুজয় বর্তমানে শিলিগুড়িতে থাকে এবং মদের নেশায় বিভোর। দীপার মুখের একটি শব্দই মৃণালের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনটাকে ওলট-পালট করে দিয়েছিল যেন। তাছাড়া দীপা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংসারের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে এখন ছেলের বউয়ের হাতে উঠেছে। দীপার চিকিৎসার খরচ-খরচা সমস্ত কিছুই ছেলে করছে। মৃণাল টাকা দিতে চাইলে ছেলের উত্তর যেন তার কাছে কেমন ঠেকে। তার মনে হয়েছে সিগারেটের নেশা তাকে ছাড়তে হবে। স্ত্রীর অসুস্থতায় সংসারের ও জীবনের এই পরিবর্তন তাকে প্রবল ধাক্কা দিয়েছিল।

দীপা হসপিটাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে কথায় কথায় মৃণাল তাকে সুজয়কে খোঁজার কথা জানায়। কিন্তু মৃণালের মুখে সুজয়ের কথা শুনে দীপা ভীষণ অবাক হয় এবং স্পষ্টতার ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বলে সুজয়ের কথা তার মনেও নেই। দীপা কেন তাকে খুঁজতে যাবে। দীপার এই অবাক হওয়ার ভঙ্গি দেখে সুজয়ের মনে হয় দীপার স্বরে এতটুকু সংকোচ ও গ্লানি নেই। তবু মৃণালের মনে সংশয় থেকে যায়। বোঝা যায় না সুজয় এতদিন কার অবচেতনে বেচে ছিল। দীপার, না মৃণালের, না দুজনেরই, "নাকি প্রতিটি ভালবাসার মাঝে এক ফালি সুজয় থেকেই যায়!"[২২] হয়তো জীবনের উপান্তে এসেও মৃণাল দীপার মনকে সঠিকভাবে অনুভব করতে পারেনি। তাই তার এই সংশয়। মৃণালের মনে হয় তার ও দীপার দুজনের মনের মধ্যেই হয়তো অন্য এক মন লুকিয়ে আছে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'যখন দুজনে একা' গল্পে দেখতে পায়, পিনাকী ও কৃষ্ণা দুজনেই ভিন্ন মনের মানুষ। কৃষ্ণার জীবন মেয়ে তানিয়া ও সন্ধ্যাকালীন মেগা সিরিয়ালকে ঘিরে। অফিস ফেরত পিনাকীর সঙ্গে একটু সময় কাটানোর মতো ফুরসৎ কৃষ্ণার নেই। তাই বাধ্য হয়েই পিনাকী পাড়ার চায়ের ঠেকে আড্ডা দেওয়া শুরু করে। কিন্তু মেয়ে চাকরি নিয়ে আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর তারা যেন পুনরায় একে অপরের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। মেয়ের দূরে চলে যাওয়ার যন্ত্রণায় দুজনেই ভীষণ ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। কিছুই আর আগের মতো ছিল না। তাই একদিন দুপুরের পর পিনাকীর প্রস্তাবে থিয়েটার দেখতে যাওয়ায় পর তারা অনুভব করতে পারে যৌবনের

 © Santiniketan Sahityapath

প্রেমের দিনগুলিকে। ভিক্টোরিয়ার মাঠের পুরোনো বেঞ্চে বসে প্রৌঢ় দম্পতি ফিরে পাচ্ছিল পুরোনো প্রেমের কাল। দুজনে চুপচাপ বসে থেকেও যেন মধুর কুজনে মগ্ন ছিল। দুজনেই মেয়ের শোকে কাতর। মেয়ের এই শোক, এবং মেয়ের সঙ্গো বাবা-মায়ের বিচ্ছেদই যেন বাবা-মাকে অর্থাৎ পিনাকী ও কৃষ্ণাকে নিকটে এনে দিয়েছে। মেয়ে ছাড়া দুজন একা মানুষ যেন দুজনের পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

প্রেমের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হায় প্রেম' গল্পে। প্রৌঢ় দম্পতি নীপা ও সুব্রত বারাণসীতে বেড়াতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে নিজেদের জীবনের এক অদ্ভুত সত্য। বারাণসীতে তারা যে হোটেলে উঠেছে সেখানেই কিশোরী বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গো এসেছিল নীপা। তখন হোটেলের ম্যানেজারের ছেলের সঙ্গো ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল নীপার। কিশোর বয়সের সেই বন্ধুত্ব, ভালোলাগা হয়তো কিছুটা ভালোবাসার দিকেও রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় ফিরে নীপা সে কথা বেমালুম ভুলে গেছে। কিন্তু ম্যানেজারের ছেলে কিশোর ওরফে পল্টু জীবনের শেষপর্বে এসেও সে ভালোবাসা ভুলতে পারেনি। নীপার প্রতি ভালোবাসার টান তাকে প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে তুলেছিল। আজীবন চিরকুমার থেকে সে নীপার জন্যই প্রেমের ধুনী জ্বালিয়ে রেখেছিল। অপরদিকে নীপা সুব্রতর সঙ্গো দিব্য সংসার করেছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর দুজনে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এককথায় নীপা ও সুব্রতর দীর্ঘ দাম্পত্য সম্পর্ক বেশ মধুর। যাই হোক, বারাণসীতে বেড়াতে এসে শেষমেষ নীপা ও সুব্রত দুজনেই বুঝতে পারে তাদের হোটেল মালিক প্রৌঢ় কিশোরবাবুই নীপার সেই নীরব প্রেমিক। কিন্তু কেউই, কারোর কাছে একথা প্রকাশ করে না। সুব্রতর মনের ভেতরটা ভার হয়ে যায় এই ঘটনায়। তার মনে হয়েছে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন কাটালেও তাদের দুজনের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাস হয়তো গড়ে ওঠেনি। সুব্রত অনুভব করেছে — "একা একাই তিন যুগ ধরে ভালোবাসার ধুনি জ্বালিয়ে রাখাটা যেমন সত্যি, সাতাশ বছর ধরে একসঙ্গো এক বিছানায় এক ছাদের নীচে বাস করেও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসে খাদ থেকে যাওয়াটাও তো সমান সত্যি।"[২৩] হয়তো তাদের দুজনের ভালোবাসার মধ্যে কোথাও সামান্য মালিন্য রয়েছিল। তাই দুজন দুজনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। মালিন্যহীন ভালোবাসা হয়তো একাকী নীরব প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যই সত্য। এই কারণেই হয়তো গল্পকার লিখেছেন — "মালিন্যহীন ভালোবাসা যে কী তা বুঝি ওই পাগলরাই জানে। কিশোরের মতো।"[২৪]

'ছবি' গল্পে দেখা যায় কমলেশ ও নীলিমার ৪৯তম বিবাহবার্ষিকীতে নাতনি জুনি ঘটনাক্রমে দাদু-ঠাম্মার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। বন্ধু পরমের পরামর্শে দাদু ঠাকুমার এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ছবি ফেসবুকে নিবন্ধ করে সে প্রচুর প্রতিক্রিয়া পায়। জুনি ঠাকুমার থেকে জানতে পেরেছে তাদের দীর্ঘ দাম্পত্যের চড়াই উতরাইয়ের কাহিনি। বিলিতি অফিসে বড়ো চাকরি করা সাহেবীআনায় অভ্যস্ত কমলেশ কীভাবে চাকরি হারানোর পর ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। তার বিলিতি কেতা, প্রবল দৌর্দণ্ডপ্রতাপ তেজ সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায়। বয়সের ভারে, পরিস্থিতির চাপে ও সেরিব্রাল অ্যাটাকের ধাক্কায় কমলেশ এখন আলাভোলা এক মানুষে পরিণত হয়েছে। উল্টোদিকে নীলিমাও নিজের সর্বস্ব দিয়ে আজীবন কমলেশের ইচ্ছার মর্যাদা দিয়েছে এবং তার পাশে থেকেছে। আজ ৪৯তম দাম্পত্য জীবনে পৌঁছে নিজের নড়বড়ে দেহটিকে নিয়ে নীলিমা অসুস্থ কমলেশের সেবা করে চলেছে। জুনি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছে কীভাবে পরম যত্নে ঊনপঞ্চাশ বছরের দম্পতির একজন অপরকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে শুকনো কপাল ও মাথার সাদা চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। এ-যেন এক স্বর্গীয় চিত্র। এই স্বর্ণ মুহূর্তকে জুনি মুঠোফোনে বন্দী করতে চেয়েও পেরে ওঠেনি। কারণ কিছু ছবি মনের গোপনকোঠোরে থাকায় শ্রেয়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আছি...' গল্পতে প্রিয়ব্রত একা একা ভেবে চলেছে সরমার কথা। সরমার স্বভাব ব্যবহার সংসার ছেলে-মেয়ে আত্মীয় পরিজন বাগান সমস্ত কিছুই নিরীক্ষণ করার যেন অখণ্ড অবসর রয়েছে প্রিয়ব্রতর হাতে। সরমার মৃত্যুর আট দিন পরেও বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালা সর্বক্ষণের জন্য অনুভব করেছে প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতকে একা ফেলে আগে আগে চলে যাওয়ার জন্য সরমার প্রতি ক্ষোভও জন্মেছে তার। লেখিকার ভাষায় — "একটা অক্ষম জ্বালা। সঙ্গো বোধহয় খানিকটা পোড়াও আছে। বলা নেই, কওয়া নেই, ড্যাং ড্যাং করে কেমন চলে গেল সরমা। এক্কেবারে বিনা নোটিশে। এতটুকু প্রস্তুতির অবকাশ দিল না! অবশ্য মৃত্যু আসন্ন জানলেও কি মনকে পুরোপুরি তৈরি করা যায়?"[২৫] প্রকৃতার্থেই সবচেয়ে আপন জনের বা প্রিয়জনের মৃত্যুর জন্য মনকে কখনোই তৈরি করা সম্ভব

নয়। প্রিয়ব্রত কিছুতেই মন থেকে সরমার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেনি। তাদের ছেলে পিকলু সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠা মেনে মায়ের শ্রাদ্ধ পালন করতে চাই। কিন্তু প্রিয়ব্রতর মনে হয়েছে কোনো মানুষের শ্রাদ্ধে কব্জি ডুবিয়ে লোক খাওয়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। আর সন্ধ্যা হলেই বিভিন্ন আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এসে সরমার মৃত্যুর জন্য শোক জ্ঞাপন করছে। প্রিয়ব্রতকে যেন সঙের পুতুলের মতো সেই আসরে বসে থাকতে হচ্ছে। এই বিড়ম্বনা প্রিয়ব্রতকে আঘাত করেছে ভীষণ। পিকলু মায়ের কাজ মিটে যাবার পর বাবাকে নিজের কাছে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু প্রিয়ব্রত কোনোভাবেই নিজের ঠাঁই ছেড়ে পুত্রের বোঝা হতে চান না। সরমা ও প্রিয়ব্রতর স্বভাব একেবারে বিপরীতধর্মী। প্রিয়ব্রত চুপচাপ নিজের মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু সরমা লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে নিয়ে হুল্লোড়ে মেতে থাকতে ভীষণ পছন্দ করতেন। রিটায়ারমেন্টের পর বাড়ির সামনে দুজনে বাগান করেছিলেন। প্রিয়ব্রত ফুলের বাগান আর সরমার সব্জির বাগান। কারোর বাগানের ফুল ও সব্জি ভাঙ্গা অপরের বারণ ছিল। তবুও প্রিয়ব্রতর বাগানের ফুল সরমার দেবতার পায়ে নিবেদিত হয়েছে। এবং প্রিয়ব্রত পাতে উঠেছে সরমার বাগানের সব্জি। সরমার মৃত্যুর পর প্রিয়ব্রত সমস্ত বাড়ি, সংসার ও বাগান জুড়ে সরমার স্মৃতিকে বারংবার অনুভব করেছে। সরমার অবর্তমানে প্রিয়ব্রত পা রেখেছে তার বাগানের অংশে। শুকিয়ে যাওয়া সব্জি গাছগুলিতে নিজের হাতে জল দিয়েছে। রাত্রে শোবার পর কানের কাছেই শুনতে পেয়েছে সরমার স্বর। সরমা জানতে চেয়েছে প্রিয়ব্রত ছেলে পিকলুর কাছে ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবে কিনা। প্রিয়ব্রত এই প্রশ্নে স্পষ্ট জানিয়েছে, সে কাউকেই ডিস্টার্ব করতে চায় না। মৃত্যুর পরেও যেন সরমা প্রিয়ব্রতর সুস্থ ও অসুস্থতা নিয়ে বিচলিত। আদতে এ সবই প্রিয়ব্রতর মনের ভাবনা। তার মনে হচ্ছে সরমা সারা বাড়ির বাতাসে, দরজায়, জানলায়, ঘরে, পুরোনো গোটা সংসারে, বারান্দার বেতের চেয়ারে, বাগানে মিশে রয়েছে। এসব ভেবে, শীত লাগতে থাকা প্রিয়ব্রতর মধ্যেও যেন আশ্চর্য এক উষ্ণতা চারিয়ে গিয়েছে। তখন অন্ধকার ঘরে নির্জন বিছানায় প্রিয়ব্রত সরমার দিকে মুখ ফিরে শুয়েছে। এইভাবেই প্রিয়ব্রতর অনুভূতিতে গোটা বাড়িটাই বেঁচে থাকবে সরমা।

'ঊনসত্তর আর তেষট্টি' গল্পে ঊনসত্তর বছরের তপোধীর আর তেষট্টি বছরের করুণা চলেছেন পুরীতে হানিমুনে। ছেলে-বৌমা, মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনিদের শলা-পরামর্শে তাদের এই ট্রেনে করে পুরী গমন। তবে ছেলে-মেয়ে, বাবা-মাকে ট্রেনে তুলে দিয়েই আশঙ্কা করেছে পুরীর সমুদ্র সৈকতে হয়তো দুটো লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ তপোধীর ও করুণা দুটি দুই মেরুর মানুষ। সমস্ত বিষয় নিয়েই তাদের মতবিরোধ লেগেই রয়েছে। দুজন দুজনের খাওয়া-দাওয়া, স্বভাব, নেশা, ব্যবহার সমস্ত কিছু নিয়েই দুজনের পিছনে মন্তব্য করছেন সর্বক্ষণ। ব্লাড প্রেসারের রোগী তপোধীর সমুদ্রের জলে নামতে চাইলে করুণা সাফ মানা করে দেয়। শুধু তাই নয়, করুণা এই হুমকি দেয় তপোধীর সমুদ্রের জলে নামলে পরের দিন ট্রেন ধরেই করুণা কলকাতায় ফিরে আসবে। তপোধীর মনে মনে জানে, শুধু করুণার বিশাল বপু নয়, তার জেদও টলানো সম্ভব নয়। বেড়াতে এসে এই কড়া অনুশাসন তপোধীরের কিছুতেই পছন্দ হয় না। ফলে রীতিমতো প্রকাশ্যে ট্রেনের কামরার মধ্যে দুজনের মধ্যে ছোটোখাটো ঠান্ডা লড়াই চলতেই থাকে। তবে এত কিছুর মধ্যেও তপোধীরের ভুলে যাওয়া তার ব্লাড প্রেসারের ওষুধ গুছিয়ে নিতে ভোলে না করুণা। অন্যদিকে করুণার হাঁটুর ব্যথার মলমটিও তপোধীর ঠিক গুছিয়ে ব্যাগে নিয়ে নেয়, যার কথা করুণা বেমালুম ভুলে গেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় তাদের এই অবিরাম বিনবিনে ঝগড়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে দুজনের প্রতি দুজনের প্রেম, ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি সবকিছু। সেই অনুভূতির কথা তারা হয়তো খুব স্পষ্টভাবে দুজনের কাছে প্রকাশ করতে পারেনা। তাই গল্পকার লিখেছেন — ''রাত এখন বড় মায়াময়। চাঁদের বুড়ি রুপোলি সুতো কেটে চলেছে চরকায়। সেই সুতোয় বোনা মসলিন এখন ভাসছে চরাচরে। রূপোলি সর মেখে ছুটছে অলৌকিক গাছপালা, ছুটছে মাঠ, ছুটছে নদী, ছুটছে বালির চর। বৃদ্ধ পৃথিবী ছুটছে সমুদ্রের পানে। জ্যোৎস্না মেখে। জোৎস্না হয়ে। সেই জোৎস্নায় একাকার হয়ে গেল কলহরাজি। জ্যোৎস্না চলেছে সমুদ্রের পানে। বড় বাত্ময় জ্যোৎস্না।''[২৬] মনের গভীরের ভালোবাসার অনুভূতি সমস্ত কলহকে প্রেমে পরিণত করে দিয়েছে।

সুচিত্র ভট্টাচার্যের 'এই মায়া' গল্পে দেখা যায় আর্য ও অপর্ণা নাতনির জন্য যন্ত্রণা পাচ্ছে। মেয়ে মিমি সন্তান প্রসবের পর চার মাস পর্যন্ত সদ্যজাত কন্যাকে নিয়ে বাবা-মায়ের ফ্ল্যাটে, যাদবপুরে ছিল। চার মাস পর নিজের সংসারে ফিরে যাওয়ার পর, বাবা-মা

 © Santiniketan Sahityapath

নাতনির অনুপস্থিতির অভাবে মনে মনে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে নাতনির জন্য এই মায়ার কোনো মূল্য হয়তো কারোর কাছে নেই। তাই এই বিরহের দিনে তারা একে অপরের মনের সঙ্গী হয়ে ওঠে হয়ে উঠতে চেয়েছে। অপর্ণা অনুভব করতে পেরেছে সহজ সরল আর্যর মনের ক্ষতের কথা। মেয়ে-জামাই নাতনিকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যাবার পর একবার ফোন করে পৌঁছানোর কোনো সংবাদ দেয়নি। এই ঘটনায় অপর্ণা এবং আর্য দুজনেই ভীষণ মর্মাহত হয়েছে। আর্য পুরনো অ্যালবামে মেয়ের ছবি দেখে যেন নাতনিকেই খুঁজে চলার চেষ্টা করেছে। অপর্ণা আর্যর এই অবস্থা দেখে মেয়ে জামাইকে মনে মনে দোষারোপ করেছে। দুজনেই চেষ্টা করেছে একে অপরকে নিয়ে ভালো থাকার, সামনের দিকে চলার। কিন্তু বিনিদ্র রাত্রে না চাইতেও তারা বারবার নাতনির কথাই বলে চলেছে, “না চাইতেও এক অনুপস্থিত শিশুর কুহকে জড়িয়ে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী। অর্থহীন কুজনে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। কালো ঘর ভরে উঠেছে নীলাভ দ্যুতিতে। স্বামী স্ত্রী ফিরতে চাইছে, থামতে চাইছে, নিজেদেরকে মুড়তে চাইছে ঘুমের আবরণে।”[২৭] কিন্তু কিছুতেই যেন মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছে না তারা। তবুও এই চরম দিনে দুজন দুজনের সহমর্মী হয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে।

এই একগুচ্ছ প্রাপ্ত দম্পতির দাম্পত্য অনুভূতির গল্প শুনতে শুনতে আমাদের একটা কথায় বারংবার মনে হয়েছে, সর্বভোগাকাঙ্খী মানুষ আজও ভালোবাসা খোঁজে। তারা ভালোবাসার সুরক্ষিত নিরাপত্তা এবং নিবিড় আশ্রয় চাই। দ্রুত পরিবর্তনশীল যুগের মৌলিক স্বভাবটি এই মানুষগুলির দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ফেলেছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য নিজের লেখনীতে এই প্রৌঢ় দাম্পত্য সম্পর্কগুলির নিবিড় গবেষণা চালিয়েছেন। আমাদের উল্লেখিত দম্পতিরা প্রত্যেকেই আর্থিকভাবে সচ্ছল। তবে তারা সম্মান, প্রতিষ্ঠা, অধিকার ও ভালোবাসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শতধা বিক্ষিপ্ত হয়েছে। লেখিকা এক দীর্ঘ সময়ের অজস্র মানব-মানবীর সম্পর্কের সমীকরণকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নারীবাদী বা পুরুষবাদী নন। সুচিত্রা ভট্টাচার্য একটি নারীর সঙ্গে একটি পুরুষের বা একটি পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর সম্পর্কের বিভিন্ন মেরুকরণ আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এই দাম্পত্য গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছেন ভালোবাসার কোনো ভাষা হয় না। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে প্রয়োজন আন্তরিক অনুভূতির। নারী পুরুষের সম্পর্কের যে সময়তে এসে শারীরিক প্রেম আর ভালোবাসার আখর বাঁধতে পারেনা সেখানে মনের অনুভব খুব প্রয়োজন। দাম্পত্য সম্পর্কে মুখে কিছু না বলেও, শারীরিক কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখিও দুটো মানুষের দুজনকে অনুভব করতে পারার ক্ষমতাটা ভীষণ জরুরী।

প্রতিমা সিতাংশুর থেকে মনের সেই নিবিড় অনুভূতিগুলিকে আশা করেছে। কিন্তু পরিবর্তে পেয়েছে সিতাংশুর রূঢ়, অস্বাভাবিক, সন্দেহদগ্ধ কথা ও ব্যবহার। উল্টোদিকে শান্ত, নরম স্বভাবের পত্নীবিয়োগগ্রস্ত উদাসীন নির্মাল্যর মিষ্টি ব্যবহার তাকে স্নিগ্ধতা দিয়েছে। প্রতিমা নিজের নরম মন দিয়ে অনুভব করতে পেরেছে নির্মাল্যর হাহাকার বা শূন্যস্থানগুলি। কিন্তু সিতাংশু নিজের বোধের সীমাবদ্ধতা থেকে প্রতিমাকে ভুল বুঝেছে। যদিও গল্পের শেষে এসে প্রতিমা সিতাংশুর এই অবুঝ ভালোবাসাকে অনুভব করতে পেরেছে। প্রতিমা-সিতাংশু, নির্মলা-মানবেন্দ্র, সুজাতা-অতীশ, মৃণাল-দীপা, কৃষ্ণা-পিনাকী, নীপা-সুব্রত, নীলিমা-কমলেশ, সরমা-প্রিয়ব্রত, করুণা-তপোধীর, মমতা-সুধাময়, আর্য-অপর্ণা এরা প্রত্যেকেই একে অপরকে জীবনের কোনো এক পর্যায়ে এসে অনুভব করতে বা বুঝতে চেষ্টা করেছে। এই চেষ্টাটাই হয়তো সম্পর্কগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে শেষ পর্যন্ত। তাই ভাঙাচোরা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়া সম্পর্কের টুকরোগুলো তারা সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে আবার সুন্দরভাবে সাজাতে চেয়েছে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য এদের মধ্যে দিয়েই হেরে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলার পরে শেষে জীবনের উত্তরণের কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের ভালোবাসার পিছুটান তাদের সম্পর্কে মধুর বীণা হয়ে বেজে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১। ‘গল্পসমগ্র’ ২য় খণ্ড, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ‘অনুভব’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ৩০১

২। ওই

৩। ওই, পৃ. ৩০২

© Santiniketan Sahityapath

৪। ওই
৫। ওই, পৃ. ৩০৩
৬। ওই, পৃ. ৩০৪
৭। ওই
৮। ওই
৯। ওই, পৃ. ৩০৫
১০। ওই, পৃ. ৩০৬
১১। ওই, পৃ. ৩০৭
১২। ওই, পৃ. ৩০৮
১৩। ওই, পৃ. ৩০৮
১৪। ওই
১৫। 'গল্পসমগ্র' ৩য় খণ্ড, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'মোহনায় এসে', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০২, পৃ. ৩১১
১৬। ওই,
১৭। ওই, পৃ. ৩১৬
১৮। 'বিভ্রম', পৃ. ৩৭৯-৩৮০
১৯। ওই, পৃ. ৩৮৪
২০। ওই
২১। 'গ্রন্থি', পৃ. ৪২২
২২। 'মনের মধ্যে মন', পৃ. ৪৩৯
২৩। 'হায় প্রেম', পৃ. ৫৪১-৫৪২
২৪। ওই, পৃ. ৫৪২
২৫। 'গল্পসমগ্র' ২য় খণ্ড, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'আছি...', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ২১৩
২৬। 'উনসত্তর আর তেষট্টি', পৃ. ২৪১
২৭। 'গল্পসমগ্র' ১ম খণ্ড, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, 'এই মায়া', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০২৩, পৃ. ৫০০

—

© Santiniketan Sahityapath